আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৭

(মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর -একটি দার্শনিক আলোচনা)

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' লেখা শুরু করেছিলাম হঠাৎ করেই। একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলো সহজ সরল ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমি ভাবিনি যে সিরিজটি পাঠকদের এত আদৃত হবে। ৫/১২/২০০৩ তারিখে শেষ পর্বটি মুক্ত-মনায় প্রকাশ হওয়ার পর অনেক পাঠক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করে সিরিজটি বই আকারে প্রকাশ করে ফেলতে উপদেশ দিয়েছেন। পাঠকদের আগ্রহকে স্থায়িত্ব দিতে মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে পুরো সিরিজটিকে বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে জন্য সমস্ত অধ্যায় গুলোকেই নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মুক্ত-মনায় যে ভার্সনটি পাওয়া যাচ্ছে তার বইয়েও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য বইয়ে থাকবে, থাকবে জটিল অংশগুলোর ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানীদের মজার মজার ঘটনা, প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনি, মুক্ত-মনার ছোটট ইতিহাস, আর একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদের মুখবন্ধ। সব কিছু হয়ত ইনটারনেট ভার্সনটিতে পাওয়া যাবে না, একটা কারণ অবশ্যই কপিরাইটের ঝামেলা এড়াতে, আর কিছুটা এখন থেকেই পাঠকদের বইটির প্রতি কৌতুহলী করে তুলবার তাগিদে! সব কিছু যদি ঠিকঠাক মত চলে, তবে এবারের একুশের বই মেলায় হত বইটিকে দেখা যেতে পারে।

শেষ অধ্যায়টি একটু বর্ধিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হল। পাঠকদের সুচিন্তিত মন্তব্য আশা করছি।

অভিজিৎ
ইমেইলঃ charbak_bd@yahoo.com
১৮/০৯/২০০৪

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

বছর তিনেক আগের কথা। একবার একটি বাংলাদেশী ই-ফোরামে এক ভদ্রলোকের সাথে দর্শনগত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র ই-ফোরামগুলোতে লেখালিখি শুরু করেছি। ভদ্রলোক আমাকে তার জীবনের একটি ঘটনা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করে বললেন,

গতকাল আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম, পার্টিতে। কিন্তু বেরুতে গিয়ে অযথাই আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই দেখি প্রচন্ড বৃষ্টি। আমার বাড়ীর চারপাশটা বৃষ্টির পানি জমে এমনভাবে ভরাট হয়ে ছিল যে, বন্ধুর বাসায় যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।

এমনি সময় আমার বাড়ীর পাশের একটা গাছ হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল আর তারপর জমে থাকা পানির উপর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতেই গাছের ডাল-পালা বিল্ডিং এর এখানে ওখানে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ে যেতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য - চোখের সামনে দেখলাম বিশাল গাছটি একটা নৌকায় পরিণত হয়ে গেল। এই নৌকায় চেপেই আমি অবশেষে আমার বন্ধুর বাসায় পৌঁছুতে পারলাম। অবাক ব্যাপার, তাই না? নৌকাটি ছিল একদম নিঁখুত, গ্রাম বাংলার মাঝিরা যে নৌকাগুলোয় দাড় বায় - একদম সেই রকম। এমন একটা নৌকা নিজে থেকেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই- আমার চোখের সামনে!

'যত সব ননসেন্স' - আপনি হয়ত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠবেন -

'কিভাবে একটা নৌকা কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজে থেকে তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

'আপনার এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরী হয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন যেন দোয়াতের বোতল থেকে কালি নিয়ে ইচ্ছে মত দিস্তে দিস্তে কাগজে ছিটিয়ে দিল আর তা সুন্দর একটা অভিধানে পরিণত হয়ে গেল!'

'কিভাবে নৌকার মত একটা জিনিস কোন পরিকল্পণা ছাড়া, কারো প্রচেষ্টা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

তাহলে অভিজিৎ সাহেব, আমায় বলুন তো- যেখানে একটা সাধারণ নৌকাই কারো ইচ্ছে ছাড়া নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে আমাদের দেহের মত জটিল সিস্টেম হুট করে কোন কারণ ছাড়াই তৈরী হয়ে যেতে পারে?

কিংবা ,

কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্ব কারো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পণা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?'

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। যেখানে একটি নৌকা নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্বকে 'সয়ম্ভু' বলে আমরা ভেবে নিতে পারি? কিভাবে ধারণা করতে পারি এই যে সুশৃঙ্খল বিশ্ব, প্রাণী-জগৎ, প্রকৃতি, গ্রহ-তারা এত সব কিছু নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া

ছাড়া? সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছে এ নয়নাভিরাম বিশ্ব? বললেই হল নাকি! মানব-মন সত্যই সায় দিতে চায় না এ ধরনের তথাকথিত 'অবাস্তব' অনুকল্পে। তাই আমাদের এই বিশ্বজগতের পেছনে সত্যিকারের 'পরম-পিতা'জাতীয় কেউ আছেন - এই স্বজ্ঞাত ধারণা তাড়িত করেছে, ভাবিত করেছে যুগে যুগে দার্শনিকদের। ৩৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিস তার একটি লেখায় বলেছিলেন -'With such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt they are work of choice or design?' প্লেটোও ভেবেছেন যে, এই মহাবিশ্ব দেখে বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নক্সাকার (Designer) রয়েছেন। তবে সবচাইতে সুন্দরভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন উইলিয়াম পিলে নামে এক ধর্মজাজক ১৮০২ সালে তার 'ন্যাচারাল থিওলজি' নামের একটি বইয়ে :

> *'ধরা যাক জঙ্গলে চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরী করেছিল?'*

পিলের এই আরগুমেন্টটি দর্শন শাস্ত্রে পরিচিত হয়েছে - 'Argument from Design' নামে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে বিগত সময়গুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব 'তৈরীর' পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন 'কারিগরের' হাত থাকতেই হবে; এই ধারণাটি একটা সময়ে আস্তিকদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হত। এখনও বেশ কিছু বাংলাদেশী ফোরামেই এই যুক্তিটি ঈশ্বরের বিশ্বাসের সপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন মুক্ত-মনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত দুটি 'বিশ্বাস নির্ভর' ওয়েব-সাইটে 'God's Existence' নামে একটি প্রবন্ধ রাখা আছে যার মূল সুরটিই হচ্ছে উইলিয়াম পিলের ঘড়ির কারিগর তত্ত্বের (Watchmaker argument) মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের চেষ্টা। তবে যারা 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের চর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের কাছে কিন্তু পিলের যুক্তির দুর্বলতা গুলো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। Oxford Universityর অধ্যাপক রিচার্ড ডকিনস তার বিখ্যাত 'The Blind Watchmaker' বইয়ে এর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এর কিছু তুলে ধরা হলঃ

১) ঘড়ির কারিগরের পিতা :

ঘড়ির যেমন ঘড়ির কারিগর থাকে, তেমনি প্রত্যেক কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে মহাবিশ্বের কারিগর রূপী ঈশ্বরের পিতাটি কে? এই প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। আর সেই

পিতার পিতাই বা কে ছিলেন, আর তার পিতা? - এমনি ভাবে প্রশ্নের ধারা চলতেই থাকবে। এই প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেবে অন্তহীন অসীমত্বের দিকে। বিশ্বাসীরা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বর সয়ম্ভু। তার কোন পিতা নেই, তার উদ্ভবের কোন কারণও নেই। তিনি অনাদি- অসীম। এখন এটি শুনলে অবিশ্বাসীরা/যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, 'ঈশ্বর যে সয়ম্ভু তা আপনি জানলেন কি করে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর সয়ম্ভু বলে ভাবছেন, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রমান্ডেরও সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এটি ভাবতে অসুবিধা কোথায়?' দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের রেজর' নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে, যার নিরিখে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটিকে সহজেই সমালোচনা করা যেতে পারে।

২) ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, আর নৌকা বানায় নৌকার কারিগর ঃ

আমি প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত ঘটনাতে ফিরে যাই। বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি নৌকা দেখে উক্ত ভদ্রলোকের নৌকাটির পিছনে কারিগর থাকার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু একটি নৌকা দেখে কি কারো মনে হতে পারে যে, একজন ঘড়ির কারিগর নৌকাটি বানিয়েছে? কখনই না। আমদের স্বভাবতই মনে আসে নৌকার কারিগরের কথা। তেমনি ভাবে আমাদের সমাজে আমরা দেখি- জুতা বানায় জুতার কারিগর, ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, সোনার কাজ করে সোনার কারিগর (স্বর্ণকার)। একই কারিগর তো সবকিছু বানাচ্ছে না। একই যুক্তিতে তাহলে আমাদের সৃষ্ট জীবনের জন্য দরকার একজন জীবনীকার, সূর্যের জন্য চাই সূর্যকার (সূর্যের কারিগর), চন্দ্রের জন্য একজন চন্দ্রাকার, আর বৃষ্টির জন্য চাই একজন বৃষ্টিকার, ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ির জন্য ঘড়ির কারিগরের উপমা নিয়ে শুরু করলেও বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর জন্য যুক্তিহীন ভাবে একজনমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পণা করে থাকেন।

৩) শুন্য হতে ঘড়িঃ সাইবাবার ম্যাজিক?

ঘড়ি বা নৌকা বানানোর জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নৌকার ক্ষেত্রে কাঠ পাওয়া যায় গাছ কেটে। ঘড়ির ভিতরের কল কব্জাগুলো বানানো হয় লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুথেকে। কিন্তু বলা হয়, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্বতৈরী করেছেন স্রেফ শুন্য হতে (ex Nihilo) । সুতরাং ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি ভুল।

৪)ভুল সাদৃশ্য :

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্যটি আরেকটি কারণে ভুল তা হল, এখানে অবচেতন মনে ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে, যেহেতু দুটি বস্তু একটি কমন বৈশিষ্ট্য বিনিময় করছে, অতএব, তাদের তৃতীয় একটি কমন বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে।
যেমন ধরা যাক নীচের উদাহরনটিঃ

a. ঘড়ির গঠন জটিল
b. ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।
c. মহাবিশ্বের গঠনও জটিল
d. সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যক।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্নায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তির ভুলটি নীচের আরেকটি উদাহরনের সাহায্যে আরো ভালভাবে পরিস্কার করা যায়ঃ

a. পাতার গঠন জটিল
b. পাতা গাছে জন্মায়।
c. টাকার হিসাব (Money bills) এর গঠনও জটিল
d.সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে নয়!)।

৫) অসঙ্গতি :
পিলের আরগুমেন্টে ধরে নেওয়া হয়েছে ঘড়ির গঠন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত পাথর, খনিজ বা পাহাড়-পর্বতের মত সহজ সরল ও বিশৃংখল নয়। তাই তার কারিগর লাগবে। আবার একই সাথে মহাবিশ্বের গঠন ধরে নেওয়া হয়েছে জটিল এবং সুশৃংখল ('সহজ সরল' প্রকৃতি এর একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও)। তাই এটি একটি অসম তুলনা।

৬) চক্রাকার যুক্তি :
'কে বানালো এমন নিখুঁত মহাবিশ্ব?' অথবা, 'বলুন তো, আমাদের তৈরী করেছে কে?' (Who created you?) -প্রায়শঃই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যুক্তিবাদীদের। কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তারা বোঝেন না যে, এধরনের প্রশ্ন বিজ্ঞানের চোখে অর্থহীন প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্নটি হবে 'এই সৃষ্টি রহস্যের প্রক্রিয়াটি কি?' বা 'আমাদের জীবন গঠনের মূল প্রিন্সিপালটি কি?' এবং বিজ্ঞান সর্বদাই এধরনের প্রশ্নের উত্তর খুজতে সচেষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ পরিস্কারভাবেই জানে যে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোন 'ঈশ্বর' নামক কোন 'বড় বাবু' নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সহজ সুত্রাবলী (Laws of Physics)। আসলে এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই ঘটছে।

প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক কারো পক্ষেই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। কাজেই, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া জ্ঞান থেকে বলা যায় 'ঈশ্বর' বলে কাউকে আভিহিত করতে চাইলে তা করা উচিত আসলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণহীন সূত্রগুলিকে।

বিশ্বাসীদের তরফ থেকে করা 'কে আমাদের বানিয়েছে' এ ধরনের প্রশ্ন আরেকটি কারণে অর্থহীন তা হল, এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে উত্তরটি আগে থেকেই গ্রহন করে নেয়া হয়েছে -'কে আবার বানাবে - ঈশ্বর!'। এটি নিঃসন্দেহে একটি loaded Question। অর্থাৎ ঈশ্বর আছে এটা ধরে নিয়েই এধরনের প্রশ্নকরে উত্তর খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের চক্রাকার প্রচেষ্টা। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান তার Who Created you? পবন্ধে ব্যাপারটি খুব পরিস্কার ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেনঃ

> **The question "WHO" created you does not make any sense because one the question already assumes an answer, that there IS a creator**, and if there IS a creator then the answer to the question cannot be but a tautology: The creator created you. Surely the questioner did not ask the question to know the name of the creator. So it is a meaningless question. As I said the right question is WHAT (not WHO) is the CAUSE of the creation of life, IF there is any. And the answer is the one above I gave (And unanimously agreed upon by majority of leading Physicists and Biologists).

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রাকৃতিক বিভিন্ন 'দৈব' ঘটনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে নানা ধরনের 'অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বার' কল্পনা করে নিয়েছে মানুষ। বনে হঠাৎ দাবানলে সমস্ত কিছু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তখন ভয়ে পেয়ে মানুষ এর পেছনে 'অগ্নি দেবীর' কল্পনা করে নিয়েছে। পুজো-অর্চ্চনা করে সেই দেবীকে তুষ্ট করতে চেয়েছে বারেবারেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায়। বৃষ্টি কেন হয় এ ব্যাপারটিও এক সময় মানুষের জানা ছিল না। তাই ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রনের জন্য মুসলিমরা যেমনি 'মিকাইল ফেরেস্তার' কল্পনা করেছে হিন্দুরা করেছে 'দেবরাজ ইন্দ্রের' কল্পনা। কিন্তু আজ স্কুলের ছোট ছেলেটিও জানে মিকাইল ফেরেস্তা বা ইন্দ্রের হাতের কারসাজিতে নয়, বৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে জলচক্র (Water cycle) অনুসরন করে। কিভাবে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, কিভাবে তা মেঘে পরিনত হয়, আর কিভাবে তা আবার বারিধারায় রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে তা আজ প্রাইমারী স্কুলের বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটা কিভাবে শূন্যে ঝুলে থাকে তা একসময় মানুষের জানা ছিল না, রহস্য সমাধান করতে গিয়ে মানুষ এই পৃথিবীটকে বসিয়ে দিয়েছে কখনও এটলাসের কাঁধে, কখনও অদৃশ্য গরুর শিং এর উপর আথবা কোন দৈত্যাকার কোন কচ্ছপের পিঠে। কিন্তু

আজকের স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররাও এটলাস-গরু-কচ্ছপ ছাড়াই স্রেফ নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র খুব ভালভাবেই শুন্যপথে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচলন ব্যাখ্যা করতে পারে। মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মানুষ একসময় কল্পনা করেছে 'অদৃশ্য আত্মার'। কল্পনা করেছে যমদূত বা আজরাইলের মত কাল্পনিক চরিত্রের। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আজরাইলের প্রাণহরনের গালগপ্প বা আত্মার অমরত্ব ছাড়াই প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুন দিয়ে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। এ বিষয়ে আমার লেখা 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' নামের একটি প্রবন্ধ মুক্ত-মনা ওয়েব-সাইটে রাখা আছে, উৎসাহী পাঠেরা সেটি পড়ে দেখতে পারেন।

এটা ঠিক যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্ত্বাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুজতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভুমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে 'God in gaps'। একটা উদাহরণ দেই। সৃষ্টির আদিতে অ্যামিনো এসিডের মত জটিল অনু কিভাবে তৈরী হল তার পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো আমাদের অজানা। বিশ্বাসীরা স্বভাবতই এর পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার ব্যাপারটি নির্দ্বিধায় মেনে নেন। এটা অনেকটা প্রাচীনকালে বৃষ্টি কিভাবে হয় তা বুঝতে না পেরে এর পেছনে 'মিকাইল ফেরেস্তা'কে কল্পনা করে গোঁজামিল দেওয়ার মত ব্যাপার। আমরা জানি, যতই বিজ্ঞান এগুচ্ছে এই ধরনের ফাঁক ফোকর থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা ভরাট করবার চেষ্টা করছে। কারণ মানুষ জানে ঈশ্বর বা অন্য কাল্পনিক সত্ত্বাকে হাজির করে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা আসলে অজ্ঞানতার সামিল। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন তার 'নতুন মানব সমাজ' গ্রন্থে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন - '*অজ্ঞতার অপর নামই হল ঈশ্বর। মানুষ তার অজ্ঞতাকে সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পায় তাই ঈশ্বর নামক একটি সম্ভ্রান্ত নাম খুঁজে বের করেছে।*' খুবই সত্যি কথা। 'ঈশ্বর কোন কিছু বানিয়েছেন' দাবী করা আসলে ঘুরিয়ে পেচিয়ে স্বীকার করে নেওয়া যে - 'আমি জানি না'। পাঠকদের অনেককেই হয়ত স্কুল জীবনে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় 'আকাশ নীল কেন' বা 'রং ধনু কিভাবে তৈরী হয়' - এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা স্বভাবতই এ ধহরনের প্রশ্নের উত্তরে অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণগুলোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন পরীক্ষার্থী যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে '*আকাশ নীল কারণ আল্লাহ আকাশকে নীল করে তৈরী করেছেন*' - এ ধরনের উত্তর পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে, তবে সে কত নম্বর আশা করতে পারে? স্রেফ শূন্য। পরীক্ষক ধরেই নেবেন যে 'আকাশ নীল কেন' এই প্রশ্নের উত্তর সেই পরীক্ষার্থী

জানে না, তাই আবোল-তাবোল লিখছে। তাই নয় কি? কাজেই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল তার উত্তরে কেউ ঝদি বলেন 'ঈশ্বর বানিয়েছেন' তবে তা হবে আসলে ওই পরীক্ষার্থীর উত্তরের মতই হাস্যকর এবং অজ্ঞতাসূচক। তাই দর্শনের পরিভাষায় এই ধরনের কুযুক্তিকে বলে 'Argument from ignorance'।

এবার দর্শন থেকে একটু বিজ্ঞানের জগতে পা রাখা যাক। আমি এর আগের একটি পর্বে বলেছিলাম যে আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অসীম ঘনত্বের এক উত্তপ্ত পুঞ্জিভূত অবস্থা (যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)) থেকে সৃষ্ট। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাঙের পর মুহূর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সুত্রগুলো দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা এর আগে দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এ ব্যাপারটিকে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -

> A singularity is a place where the **classical concepts of space and time break down** as do all the known laws of physics because they are all formulated on a classical space-time background. ... [T]his breakdown is not merely a result of our ignorance of the correct theory but represents a fundamental limitation to our ability to predict the future [of the singularity], a limitation that is analogous but additional to the limitation imposed by the normal quantum-mechanical uncertainty principle (*সূত্রঃ Stephen Hawking, 'Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse' Physical Review D 14 (1976): 2460. Since 1982*).

তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে, ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তা করেছেন এক উদ্দেশ্যবিহীন এবং নিয়ম বিহীন অবস্থা (অদ্বৈত বিন্দু) থেকে। বিশ্বাসীরা সর্বদাই এই মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির সৃষ্টির পেছনে এক মহাবুদ্ধিমান এক অজ্ঞাত সত্ত্বার 'সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য' এবং 'অভাবিত দিক নির্দেশনার' সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি কোন নির্দিষ্ট কারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনই তবে তিনি তা উদ্দেশ্যবিহীন (purposeless) নিয়মবিহীন (lawless) এবং অগোছালো (chaotic) অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে যাবেন কেন? তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো হওয়া উচিৎ অনেক বাঙ্ময়,

ব্যাপ্ত, উদ্দেশ্যমূলক এবং নিশ্চয়তাপ্রদানকারী। কিন্তু বাস্তবতাটি ঠিক উলটা। দার্শনিক Quentin Smith তাই তার Simplicity and Why the Universe Exists প্রবন্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন (সুত্রঃ Philosophy *71 (1997): 125-32*)ঃ

> 'It has been countered that God could intervene in his creation at the big bang singularity and ensure that it explodes in a big bang that has the laws and physical conditions that lead to the evolution of intelligent life. But this response is implausible, **since this would be an irrational way to create a universe with intelligent beings**; there is no reason to create a singularity that requires immediate corrective intervention to ensure the desired result.'

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়েইনবার্গের কথায়ও লক্ষ্য করা যায় একই সুর (*সূত্রঃ অপার্থিব জামান, ঈশ্বরের অস্তিত্ব- সৃষ্টির যুক্তি খন্ডন*, মুক্ত-মনা)ঃ

> ‘যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোন মুর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।’

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের অনেকেই ভেবে নেন যে সৃষ্টির আদিতে শুন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি স্রেফ অলৌকিক একটি ব্যাপার - এবং এই ব্যাপারটি কেবল ‘ঈশ্বর’ নামক একটি সত্ত্বার ‘ভেল্কি-বাজি’ দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। এমনভাবে ভাবার কারণও আছে। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি শুন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে - এই যে আমরা আজ চোখের সামনে পরিচিত পদার্থ আর শক্তির জগৎ দেখছি তার উদ্ভব কোথা থেকে ঘটল? কিভাবে শূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি হল? কিভাবে তৈরী হল আমাদের এ বিশ্বজগৎ? আসলে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ চুকিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পাঠ নিতে হবে। ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা একটু জটিল। সহজ বাংলায় বললে বলতে হয়, ‘শুন্য থেকে কোন পদার্থ তৈরী হয় না’ - এ ধারণাটি চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের জগতে হয়ত সত্য, তবে কোয়ান্টাম পদার্থের জগতে সত্য নয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছে যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসরন করে শুন্য থেকে পদার্থ ও শক্তি তৈরী হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে ‘ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’ (vacuum fluctuation)।

অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার অব অ্যাস্ট্রোবায়লজির অধ্যাপক পল ডেভিসের মতে,

> In the everyday world, energy is always unalterably fixed; the law of energy conservation is a cornerstone of

> classical physics. But in the quantum microworld, energy can appear and disappear out of nowhere in a spontaneous and unpredictable fashion. (*Paul Davies, God and the New Physics. London: J.M. Dent & Sons. 1983, p 162*)

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রায়ন, ১৯৭৩ সালে। তবে তারও আগে 'বিগ-ব্যাঙের জনক' গ্যামোর মাথাতেও ধারণাটি এসেছিল। গ্যামো তার 'My World line' গ্রন্থে ১৯৪০ সালে আইনসটাইনের সাথে কথোপকথনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। গ্যামো খুব হাল্কা চালে সেদিন আইনসটাইনকে বলেছিলেন, 'আমার এক ছাত্র সেদিন আপনার সমীকরন গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলো যে একটি নক্ষত্র কিন্তু স্রেফ শূন্য থেকে উদ্ভুত হতে পারে, কারণ আপনার সমীকরনে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষন শক্তি ধণাত্মক ভর-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।' শুনে আইনসটাইন একটু থমকে দাড়ালেন। গ্যামো বললেন, 'আমরা ওই সময় দুজনে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, আর এত গাড়ি ঘোড়ার ভীরে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল' ।

আমরা জানি পদার্থের ভর এবং শক্তি সম্পর্কিত হয় আইনসটাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ দিয়ে। যদি পর্যাপ্ত শক্তি বিদ্যমান থাকে, ফোটন থেকে যে কোন সময় পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল তৈরী হতে পারে। এর নাম 'যুগল উৎপাদন' (pair production) এবং এই ব্যাপারটিই মহাবিশ্বের ভর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ট্রায়নের ধারণা অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে শূন্যাবস্থা থেকে বড় সড় এক ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে আনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্যদেশকে আপাতঃ দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তৈরী হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকটন এবং পজিটন (পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল) থেকে পদার্থ তৈরী হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটার স্থায়ীত্বকাল

মাত্র 10^{-21} সেকেন্ড। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত কোন রূপকথার জীব নয়, নয় কোন গানিতিক বিমূর্ত মতবাদ; বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন*।

রিচার্ড মরিসের ভাষায়,

> 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে 'শূন্যতা' বলে আসলে কিছু নেই। এমনকি সত্যিকার ভ্যাকুয়ামেও প্রতিনিয়ত ভার্চুয়াল কণিকার যুগল ক্রমাগত উদ্ভুত হচ্ছে, আবার বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই সব ভার্চুয়াল কণিকার অস্তিত্ব কোন গানিতিক কল্পণা নয়। যদিও আমরা এগুলোকে চোখে দেখি না, কিন্তু এগুলোর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এগুলোর অস্তিত্ব যে আছে, এই ভবিষ্যৎবানী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে খুব নিখুঁত ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে' (Richard Morris, The Edges of Science. New York: Prentice Hall., 1990, p25)

তবে ট্রায়ন প্রথমে যে ভাবে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন, তাতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ায় ১৫০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। আর দ্বিতীয়তঃ এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যাবস্থা (empty space) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়- আদিতে সেই শূন্যাবস্থা (space)ই বা এলো কোথা থেকে (পাঠকদের এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, স্পেস কে কিন্তু দেশ কালের বক্রতার পরিমাপে প্রকাশ করা হয়)? ১৯৮২ সালে আলেকজান্দার ভিলেঙ্কিন (Alexander Vilenkin) এর একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে - মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই 'শূন্য' থেকে - তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু 'পদার্থবিহীন' শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময়শূন্যতা এবং স্থানশূন্যতাও বটে। ভিলেঙ্কিন কোয়ান্টাম টানেলিং এর ধারণাকে ট্রায়নের এর তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তোরিত হয়েছে অশূন্য আবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মত আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে।

ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে শূন্য অবস্থা থেকে কিভাবে আমাদের এ মহাবিশের উদ্ভব আর বিস্তার ঘটতে পারে তা সাধারণ পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত '*দি ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম*' গ্রন্থে :

---

* 'কাসিমির এফেকট' - ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিখ কাসিমিরের ভবিষ্যদ্বানী, যা পরবর্তীতে মার্কস স্প্যার্ণে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

> There are something like ten million million million million million million million million million million million million million million (1 with eighty zeroes after it) particles in the region of the universe that we can observe. Where did they all come from? The answer is that, in quantum theory, particles can be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. But that just raises the question of where the energy came from. The answer is that the total energy of the universe is exactly zero. The matter in the universe is made out of positive energy. However, the matter is all attracting itself by gravity. Two pieces of matter that are close to each other have less energy than the same two pieces a long way apart, because you have to expend energy to separate them against the gravitational force that is pulling them together. Thus, in a sense, the gravitational field has negative energy. In the case of a universe that is approximately uniform in space, one can show that this negative gravitational energy exactly cancels the positive energy represented by the matter. So the total energy of the universe is zero. (*Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 1988, p. 129.*)

আসলে ১৯৮১ সালে মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (cosmic inflation) আবির্ভাবের পর থেকেই বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin of universe as Quantum Tunneling effect" Physical review D25 (1982): 2065-73; S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercolled Phase Transitions in the very early Universe", Physics letters B110(1982):35-38; Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28, Andre Linde, "Quantum creation of the inflamatory Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405 ইত্যাদি। সাধারণ পাঠকদের জন্য পেপারগুলো অতিরিক্ত প্রায়োগিক এবং জটিল মনে হতে পারে[†], কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটির উল্লেখ এ কারণেই করা হল, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, বহু বিখ্যাত পদার্থবিদই আজ স্রেফ শুন্যাবস্থা থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপাত্তির সম্ভাব্যতার এই বৈজ্ঞানিক ধারণাটির উপর জোর নজর দিচ্ছেন, হাস্যকর বা 'ননসেন্স' ভেবে কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না।

[†] অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় লেখা জনপ্রিয় ধারার প্রবন্ধের জন্য Halliwell, Jonathan J. "Quantum Cosmology and the Creation of the Universe." Scientific American 265 (December 1991): 76. দেখুন।

ভিকটর স্টেংগর পেশায় ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াইয়ের 'ফিসিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমি' বিভাগের Emeritus Professor এবং কলোরাডো ইউনিভার্সিটির দর্শনের Adjunct Professor. তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স' এরও প্রেসিডেন্ট আর নেশায় যুক্তিবাদী। তিনি আমাদের মুক্তমনা ফোরামের একজন সম্মানিত সদস্য। তার '***Has Science Found God?*** *The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe*' সাম্প্রতিক সময়ের অত্যন্ত আলোড়ন তোলা বই। তিনি বইটির 'The Uncreated Universe' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যতার সূত্র লংঘন না করেই কিভাবে শূন্য থেকে বিশ্বজগৎ সষ্টি হতে পারে; এবং এর মধ্যে 'অলৌকিকত্ব' কিছু নেই। তার ভাষায়-

> '...In other words, NO energy from the outside was required to "create" the universe. What is more, this is also a prediction of inflationary cosmology, which we have seen has now been strongly supported by observations. Thus we can safely say, **No violation of energy** conservation occurred if the universe grew out of an initial void of zero energy.'

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, শূন্য থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছেই - এটা কিন্তু আমি হলফ করে বলছি না। মানে, আমি কোন তত্ত্ব পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না এখানে। যেটা বলতে চাইছি তা হল এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি 'হতে পারে', এবং এটি সাম্প্রতিক গবেষনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের সাথে মোটেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শেষ কথা বলবার সময় এখনই আসে নি। শেষ কথা বলতে পারে বিজ্ঞান। শেষ কথা জানতে চাইলে আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে গত্যান্তর নেই।

অতি সম্প্রতি বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারনা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে । তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যেটি হল : সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প (Intelligent Design argument)। এটি মূলতঃ পিলের ডিজাইন আর্গুমেন্টেরই বর্ধিত রূপ। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্ব ঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ। ব্যাপারটা একটু ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষনের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষন সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন

যাকে আমরা বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট । নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমানবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরনীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন তা নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপান্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিনত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না। জন ডি. ব্যারো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি

মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষনীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। যেমন, প্রায়ই আমরা শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে যে ধরনের পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। আমাদের মুক্ত-মনা সদস্য এবং বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কোন সুক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলোতে নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'অ্যানথ্রোপিক কোইন্সিডেন্স' ঘটানো যায়, ঈশ্বরের হাত ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোন ছেলে খেলা নয়, বরং রিচার্ড ক্যারিয়ারের ভাষায়, একটি 'সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট' যা *Philo*, 3:2 (Fall-Winter 2000) জার্নালে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেও ডঃ

স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তাঁর ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'Fine Tuners have no basis in current knowledge for assuming that life is impossible except for a very narrow, improbable range of parameters' তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না।

'ফাইন টিউনিং' আর্গুমেনটের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি 'A Designer Universe? ' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

> 'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ্ম-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।' তিনি কার্বন তৈরীর পেছনে 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' এর চেয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উচ্ছ্বাসের সাথে ইদানিং ব্যবহার করা হয় জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার' রা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। আসলে মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। সেজন্যই রিচার্ড ডকিন্স তার 'The "know-nothings", the "know-alls", and the "no-contests"' প্রবন্ধে বলেন,

> 'Science offers us an explanation of how complexity (the difficult) arose out of simplicity (the easy). The hypothesis of God offers no worthwhile explanation for anything, for it simply postulates what we are trying to explain.'

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি- 'The universe is not fine-tuned for humanity; Humanity is fine-tuned to the Universe'। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আমদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোওভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, ঈশ্বর আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরনের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না । পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে 'ঈশ্বর নির্ধারিত মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীরে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং এ্যলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের

প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বিশেষ সৃষ্টি মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির মাঝখানে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝখানে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং', 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষনীয় বলে মনে হয়।

অনেকেই মনে করেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' বিশ্বাস-নির্ভর ধারণাটি একটি অপ্রয়োজনীয় ধারণা এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে তা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্নীত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যেমন, আমরা এখনও জানি না পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কিভাবে একটা সময় তৈরী হল, জানি না দেড় হাজার কোটি বছর আগে মহাকাল ও মহাশূন্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা, আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি নি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি কেন প্রতিকণিকার তুলনায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল কণিকাদের প্রতি, কৃষ্ণ-গহবরের কেন্দ্রে বা কি রয়েছে, কেনই বা মহাবিশ্ব ত্বরিত হচ্ছে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মত কি আরো অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে? - এ ধরণের নানা প্রশ্নের উত্তর। এধরনের প্রান্তিক প্রশ্নগুলো হয়ত সাময়িক সময়ের জন্য আমাদের চিন্তা চেতনাকে অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন কি করে প্রহেলিকা কাটাতে হয়, কিভাবে মানুষকে আলোকিত করে তুলতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাই দেখে এসেছি। সেজন্যই তাঁরা আলোর প্রদীপ হাতে চলা আঁধারের যাত্রী। আমাদের মনে পশ্ন থেকে যাওয়া মানে ব্যর্থতা নয়, বরং এটি আমাদের অগ্রগামীতারই সূচক, জ্ঞানের পরবর্তী স্তরে উত্তরণের প্রেরণা।

আমি আমার এই প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে। এই ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ ডঃ মেঘনাদ সাহার 'হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ' থেকে। তার বর্ণিত ঘটনাটি এরকম :

বিখ্যাত গনিতজ্ঞ ল্যাপ্লাস তার সুবিখ্যাত 'Mechanique Celeste' গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন, গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষন দিয়ে পর্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়ানকে উৎসর্গ করবার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন, তখন নেপোলিয়ান রহস্য করে বলেনঃ 'মসিয়ে ল্যাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের

চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি সারা বইয়ে কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেননি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?' ল্যাপ্লাস উত্তরে বলেন- 'Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese' অর্থাৎ- 'Sire, I have no need of that hypothesis.' (এই অনুকল্পের কোন প্রয়োজন আমার কাছে নেই।)

এক নজরে আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীরা

পাঠকের প্রতিক্রিয়া
Reader's Comment